থিয়েটার — প্রতিবাদের মাধ্যম

কুন্তল মুখোপাধ্যায়

ব্যক্তিগত স্তরে আমি সমাজবিজ্ঞানের ছাত্র এবং কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। সেই হিসেবে থিয়েটারকে আমি সমাজ বিজ্ঞানের একটি শাখা বলে মনে করি। আমার এই মতের সমর্থন আমি পাই শ্রীমোহিত চট্টোপাধ্যায়ের কাছ থেকে, যখন আমি অনুষ্টুপ পত্রিকার হয়ে নাট্য বিষয়ক প্রথম সংখ্যা সম্পাদনা করি। কিন্তু আমার এই ধারণা আমার কিশোর বয়স থেকে। আমি তখন সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে ছাত্র ছিলাম। ১৯৭০-৭৩ এবং তার আগের পর্বে যখন স্কুলের ছাত্র এবং যে সময়ে আমার মননে বা চিন্তনে প্রথম সাংস্কৃতিক ঘাত প্রতিঘাত আলোড়িত হতে শুরু করে, সে সময়েই পশ্চিমবঙ্গের সমাজে, রাজনীতিতে এক উত্তাল অবস্থা। এই সময়েই আকস্মিক কিছু কারণে উৎপল দত্তের বিভিন্ন যাত্রা নাটকের প্রস্তুতিপর্ব যাকে আজকের ভাষায় আমরা বলি থিয়েটারমেকিং – এর সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটে। আমার মামা ছিলেন বিখ্যাত যাত্রাভিনেতা শেখর গাঙ্গুলী। সেই সময় লোকনাট্য দলে উৎপল দত্তের রচনা ও পরিচালনায় 'দিল্লী চলো', 'সন্ন্যাসীর তরবারি', 'সমুদ্রশাসন' যা পরবর্তী কালে 'সূর্যশিকার' নামে অভিনীত হয়, এবং 'ঝড়' (বিপ্লবী ডিরোজিওর জীবনী নিয়ে) প্রযোজনার প্রস্তুতির সঙ্গে আমি পরিচিত হই। ফলে ঐ ছাত্র বয়স থেকেই সমাজ, রাজনীতি এবং থিয়েটারের সম্পর্কটা আমার কাছে ক্রমশই পরিষ্কার হতে থাকে। আগেও বলেছি যেহেতু আমি পাঠক্রমের দিক থেকেও রাজনীতি, সমাজতত্ত্ব, অর্থনীতি এবং ইতিহাসের তন্নিষ্ঠ-ছাত্র ছিলাম, সেহেতু থিয়েটারকে শুধুমাত্র বিনোদনের উপায় না ভেবে সামাজিক দায়বদ্ধতার একটি প্রকাশ মাধ্যম হিসেবে ভাবতে শুরু করলাম।

এই সময়েই সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে 'বেঙ্গলী লিটারেসি সোসাইটি' নামে যে সংস্থা ছিল সেই সংস্থার পক্ষে আমি নাটক পরিচালনা, অভিনয় এবং শেষাবধি প্রয়োজনবোধে নাটক রচনার দায়িত্বও নিই। এই সময় আমার রচিত প্রথম নাটক *'কেউ হব না রাজা'* যাতে হয়তো অদৃশ্যভাবে হলেও পিরানদেল্লোর কিছু প্রভাব ছিল, আমরা মঞ্চস্থ করি। বিভিন্ন আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিযোগিতা মঞ্চে অভিনয় করতে শুরু করলাম। তবে তখন সব থেকে বেশী যে কাজটা করতাম, সেটা হচ্ছে থিয়েটার দেখা। শম্ভু মিত্র, উৎপল দত্ত, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়-৬০ এর দশকের শেষ থেকে ৭০ দশকের শেষ অবধি প্রায় সবকটি বিখ্যাত প্রযোজনাই আমার দেখা। এছাড়া যেহেতু দমদমে থাকতাম, সেহেতু খুব ছোটে থেকেই বিভাস চক্রবর্ত্তী, অশোক মুখোপাধ্যায়ের থিয়েটার ওয়ার্কশপের থিয়েটার প্রযোজনার সাথে পরিচিত হতে শুরু করলাম। *'রাজরক্ত', 'চারুভাঙা মধু', 'নাজির বিচার', 'পাঁচু ও মাসি'* এবং নীলকণ্ঠ সেনগুপ্তের *'বিভুর বাঘ', 'পরবর্তী বিমান আক্রমন', অসিত বসু'র 'কলকাতার হ্যামলেট', জোছন দস্তিদারের 'পদ্যগদ্য প্রবন্ধ'* এবং সর্বোপরি অরুণ মুখোপাধ্যায়ের 'মারীচ সংবাদ', আমার থিয়েটার দেখা, বোঝা বেং কেন থিয়েটার করব এই উপলব্ধির ভিত্তিমূল তৈরি করে দেয়ে। এই সময় থেকেই আমিবুঝি যে সমাজ নিরপেক্ষ কোনও থিয়েটার হতে পারে না, রাজনীতি নিরপেক্ষ কোনও থিয়েটার হতে পারে না। স্বভাবতই প্রশ্ন উঠতে পারে, রাজনীতি বলতে আমি কি বোঝাতে চাইছি। জানা কথাই প্রচলিত ধারণা রাজনীতি বলতে আমার বিশেষ কোনও দল, বিশেষ কোনও মতবাদ, বিশেষ কোনও সরকারের পক্ষ বা বিপক্ষ অবলম্বন ইত্যাদি বিষয় নিয়ে জড়িত ঘটনাগুলিকে চিহ্নিত করি। কিন্তু এর বাইরেও রাজনীতির একটি পরোক্ষ বা সেই ভাবে প্রত্যক্ষ দৃশ্যমান নয় একটি অন্তঃসলিলা স্রোত রয়েছে। যদি আপত্তি না থাকে আমি আমার রচিত 'Theatre and Politics' বই থেকে একটি অংশ তুলে ধরছি — "When a Theatre strives to change the beliefs and opinion of the spectators, raise political issues, explore national and international problems, or asks political question, the theatre can be termed political,. This intentionality must be present in a play for it to be termed political.

Political Theatre is intellectual. The goal of most political theatre is to reach an audience of the masses, an audience of working people, an audience of common man to put across political

ideas. Also political theatre inshes to change someone's beliefs and opinions of those who do not already agree. Thus the intellectual conten at the political theatre distinguishes it from other theatre". - এই খান থেকেই অর্থাৎ এই যে রাজনৈতিক থিয়েটারে intellectual দিকটা থেকে এবং তার প্রত্যক্ষ intention এই দুটোর মিশ্রণকে আমি যথার্থ রাজনৈতিক থিয়েটার বলি। এই কারণেই আমার কাছে *'কল্লোল'* বা *'মানুষের অধিকারে'* যতটা রাজনৈতিক নাটক *'রাজরক্ত'* বা *'মারীচ সংবাদ'* ও ততটাই রাজনৈতিক নাটক। *'কলকাতার হ্যমলেট'* বা *'দানসাগর'* বা *'টিনের তলোয়ার'* মাত্রাগত ভিন্নতা সত্ত্বেও বিষয়ীগত (subjective) দিক দিয়ে রাজনীতির কোনও ভিন্নতা আছে বলে আমি মনে করি না। মার্কসবাদ লেনিনবাদকে বা বৈজ্ঞানিক সমাজবাদকে সমাজ জীবনের একটি পদ্ধতি বা approach হিসেবে বিবেচনা করে যদি আমি নাটকে রাজনীতি অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হই তাহলে দেখা যাবে আপাত দৃষ্টিতে যা শুধুমাত্র ক্লাসিক সাহিত্য বলেই বিবেচিত, তার মধ্যেই নিহিত রয়েছে রাজনীতির নির্যাস। উদাহরণ হিসেবে আমি রবীন্দ্রনাথের *রক্তকরবী, বিসর্জন* নাটকদুটির কথা উল্লেখ করব।

এই প্রেক্ষাপটকে মাথায় রেখেই সংলাপ কোলকাতার প্রায় সূচনালগ্ন থেকেই আমরা যে নাটকগুলো অভিনয় করেছি যেমন *ইস্পাত, তলোয়ার, হেড অফিসের বড়বাবু, ধর্মরাজ্য, দিশা*-তার সবগুলির মধ্যেই রাজনীতি কোনও না কোনওভাবে জড়িত আছে। আমার স্বীকার করতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠা নেই যে এই পর্বে আমার অনেক কাজই, আমার আজকে মনে হয়, তেমন matured ছিল না। কিন্তু তাই বলে সেগুলোর গুরুত্ব কম নয়। কারণ আমি প্রত্যক্ষভাবে কোনও বড় দলের থেকে বেরিয়ে এসে বা বিশিষ্ট নাট্য ব্যক্তিত্বদের প্রশিক্ষণ থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়ে নাটকের দল তৈরি করিনি। এমন কি খারাপ শোনালেও বলতে হবে আমি কোনও বিখ্যাত বাবার বিখ্যাত সন্তান নই। ফলে আমি ভুল করেছি, ঠেকেছি, শিখেছি - এবং ক্রমশই এই trial and error পদ্ধতিতে নিজেকে এবং নিজের থিয়েটারবোধকে খোঁজার চেষ্টা করেছি। এই অনুসন্ধানের পথে হ্যারল্ড পিন্টার অবলম্বনে *'ঘরে ফেরা'* এবং হ্যান্সরেবি অনুপ্রাণিত *'স্বপ্ন নিয়ে'* নাটক দুটি আমাকে এবং আমাদের দলকে কিছুটা পরিচিতি এনে দেয়। এই পরিচিতি খুব স্বল্প হলেও একটা বিস্ফোরণ ঘটে *'শূদ্রায়ন'* নাটকে। কারণ এই সময় থেকেই আমি একটি অন্যধারার থিয়েটার অনুসন্ধানে রত হই। ইতিহাস, নৃতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব প্রভৃতির সাহায্য নিয়ে এক দীর্ঘ গবেষণার ফসল হিসেবে রামায়ণের মিথ কে সরিয়ে তার রিয়ালিটি কে অর্থাৎ তার ঐতিহাসিকতাকে বাস্তবে তুলে ধরার প্রচেষ্টা করি *শূদ্রায়নে*। শূদ্রায়নের মূল বিষয় এই রকম- আর্যদের দক্ষিণমুখী অভিযানের কাহিনি নিয়েই রামকথা রামায়ণের বিন্যাস। গাঙ্গেয় উপত্যকার কৃষিজীবী এবং বিন্ধ্য অঞ্চলের আদিবাসী শিকারী ও খাদ্য সংগ্রহকারী দুই মানব গোষ্ঠীর পারস্পরিক বিবাদ সংঘাত ক্রমে একে অপরের মধ্যে মিশে যাওয়ার গাথা ও কথা নিয়েই তৈরি হয়েছে রামায়ণ। আর্যায়ণ প্রক্রিয়াই রামায়ণের মূল কথা। আমাদের নাট্যকাহিনি রামায়ণের এই প্রেক্ষাপট অনুসারী। আর্যেতর গোষ্ঠীর লোকেদের আর্যবর্ণগোষ্ঠীর লোকেদের আর্যবর্ণগোষ্ঠীর নিম্নতর অবস্থানে স্থান দেওয়ার অনুষ্ঠান হল *'শূদ্রায়ণ'*। শূদ্রায়ণের প্রাসঙ্গিকতায় আর্য ও আর্যেতর দুই আপাতবিরোধী মানবগোষ্ঠীকে নতুন করে দেখার অবকাশ রয়েছে। নিমিতি ও বিনির্মিতির খেলায় এ এক অন্য রামায়ণের কাহিনী। শূদ্রায়নের অনুপ্রেরণা আমি পাই রোমিলা থাপার, জি.এস. ঘুরে, এইচ.ডি.শাঙ্কালা, আর -এল-শর্মা প্রভৃতির গ্রন্থে। একই সঙ্গে রামায়ণ এবং কর্ণাটকের রঙ্গনায়কাম্মা প্রভৃতির লেখা রামায়ণের নানাবিধ ব্যাখায় উপরে উল্লিখিত শূদ্রায়ণের মূল বিষয়টির সমর্থন পাওয়া যায়, এই যে বল প্রয়োগে নয়, through persuation সংস্কৃতির মায়াজালে বদ্ধ করে নিম্নবর্ণের দলিত মানুষদের নিজেদের দাসে পরিণত করার প্রয়াস তা কি আজকের সমাজেও লক্ষ্য করা যায় না? আন্তর্জাতিক স্তরেও সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদের নামে বা আমাদের দেশে গৈরিকীকরণের ধোঁয়া তুলে এমনকি আমাদের পশ্চিবঙ্গেও আমাদের নাট্য এলিটদের পৃষ্ঠপোষকতার ছদ্ম আবরণে কি এই একই দাসায়ণের প্রভাব পরিলক্ষিত হয় না? তাই শূদ্রায়ণ দেখে যখন প্রতুল মুখোপাধ্যায় বলেন যে, *'শূদ্রায়ণ'* নাটক দেখে আমি শুধু মুগ্ধ নই, রীতিমত উত্তেজিত – এই সাংস্কৃতিক আগ্রাসন ও দাসায়নের যুগে এই নাটকের বড় প্রয়োজন ছিল' বা অন্নদাশংকর রায় যখন বলেন, 'শূদ্রায়ণ রামায়ণের অভিনব মঞ্চায়ন' তখন আমরা অর্থাৎ আমি ও আমাদের দল আমাদের কাজের প্রতি এক ধরণের আত্মবিশ্বাসে উপনীত হই। অনেকেই আমাকে জিজ্ঞাসা করেছেন *শূদ্রায়ণ* কি সকলে বুঝতে পারবে? কিন্তু পরিস্যখ্যান দিলে বোঝা যাবে যদি শূদ্রায়ণ নাটকের তিরিশ শতাংশ অভিনয় আমরা কলকাতা শহরে করে থাকি, তবে সত্তর শতাংশ করেছি সফস্সলে, গ্রামে গঞ্জে। হুগলীর পুরশুরায় বা বীরভূমের প্রত্যন্ত গ্রামে বা নদীয়ার বীরনগরে, সাধারণ মানুষ এমন কি গলায় কুপি ঝুলিয়ে বাদাম বিক্রীওয়ালা এ নাটককে যেভাবে গ্রহণ করেছে, তাতে আমার মনে হয়েছে যে নাটকই পারে একমাত্র রাজনৈতিক

যোগাযোগের সক্ষম মাধ্যম হিসেবে কাজ করতে। শুধু তাই নয় এই সময় থেকেই – আমার মনে হয়েছে যেকথা প্রায়শই উৎপল দত্ত বলতেন বা ব্রেখটের বইতে পড়েছি এবং রবীন্দ্রনাথের নাটকে যে উপলব্ধি করেছি যে দেশীয় ইতিহাস, দেশীয় ঐতিহ্যকে নতুন করে তার কলোনিয়াল ব্যাখার আবরণ ছিন্ন করে তাকে যদি বাস্তবের মাটিতে প্রোথিত করা যায়, তবে তা আপাতদৃষ্টিতে দুরূহ মনে হলেও, সাধারণের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠতে কোনও অসুবিধাই হয় না। রামায়ণের ঐতিহাসিকতা এবং তার কাল্পনিকতায় প্রভেদ কোথায় আমি *শূদ্রায়ণে* দেখাবার চেষ্টা করেছি। আমি দেখাবার চেষ্টা করেছি যে বিভিন্ন উপজাতি দলিত নিম্নবর্ণের মানুষদের কিভাবে আর্য ঋষিরা যাদের আধুনিকভাষায় বলা যায় "Think Tank" রামকে যন্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে নিজেদের দাসে পরিণত করেছেন। শুনলে অবাক হতে হয় যে দক্ষিণ ভা রতে দশেরার দিন, উত্তর ভারতে যেমন রাবণ পোড়ানো হয়, তেমনি রাম পোড়ানো হতো। বি.জে.পি. সরকার তা আইন করে নিষিদ্ধ করে দেন। দক্ষিণ ভারতে সুর্পনখার মন্দির আছে। রাবণ বা সুর্পনখা সেখানে বীর হিসেবেই পূজিত হন – আমাদের এখানকার রাম বা কৃষ্ণের মতই। কম্বল রামায়ণের প্রভাবেই বোধ হয়, মাইকেল মধুসূদন লিখতে পেরেছিলেন 'Ravana is my hero' অনেকটা এই ভাবধারায় প্রভাবিত হয়েই আমি রামায়ণের একধরনের পুনর্বিন্যাস ঘটিয়েছি। আধুনিক কায়দায় Post modernism বা deconstruction বলছি না। তার কারণ Post modernism deconstruction এর নামেও আসলে এক ধরমের সাংস্কৃতিক দাসায়নের কর্মপদ্ধতি শুরু হয়েছে যেটা না উপলব্ধি করেই আমরা অনেকে নিজেদের post modernist বলে গর্বিত বোধ করছি।

এই সূত্র ধরেই আমি বাঙালি মনীষা দীপঙ্করের জীবনের অনুসন্ধানে ব্রতী হই *'কালচক্র'* নাটকে। *কালচক্র* আজ থেকে একহাজার বছর আগের বৌদ্ধদের একটি উৎসব। এই সময় বৃহৎবঙ্গ দেশে পালরাজাদের শাসনকাল। দ্বিতীয় মহীপালের রাজত্বকাল। বৌদ্ধ মহাযানী সম্প্রদায় যারা মনে করতেন মানব সেবাই তাদের মূলমন্ত্র বা মূলধর্ম তাদের মধ্য থেকেই তান্ত্রিক বজ্রযানের উদ্ভব হয়, বৌদ্ধ সংঘের সাংগঠনিক দুর্বলতার কারণে যারা মনে করে ব্যক্তিগত নির্বাণলাভই ব্যক্তির মুক্তির, আত্মার মুক্তির একমাত্র পথ। আবার এই সময়েই বঙ্গদেশে বণিক সমাজ খুবই dominent এবং অনেক ক্ষেত্রেই তারা নিজ নিজ ক্ষেত্রে Autonomy ভোগ করতেন। যেখান থেকে পরবর্তীকালে মঙ্গলকাব্যের চাঁদবেনের গল্প বেরোয়। আবার এই সময়েই জালিক গোষ্ঠী, জলে যাদের জীবিকা অর্থাৎ যারা জেলে, ছোট ছোট ব্যবসায়ী যারা নিজেদের মাল নিয়ে বড় ব্যবসায়ীদের নৌকা নিয়ে বাণিজ্য যাত্রায় যায় তারা একটি সংঘ গঠনের চেষ্টা করে। রমেশ দত্তের Economic History of Bengal এ এর একটা আভাস পাওয়া যায়। Fiction writer হিসেবে এই আভাসটিকেই আমি আমার নাটকে উপাদান হিসেবে ব্যবহার করি। এই সময়েই আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো সহজিয়া সিদ্ধাইদের আবির্ভাব ও সাধারণ নিম্নশ্রেণীর মানুষদের কাছে তাদের চিন্তা ও কর্মধারার আবেদনগ্রাহ্যতা; যেখান থেকেই শুরু হয় চর্যাপদ – বাংলা ভাষার প্রথম সাহিত্য সৃষ্টি। এই যে কালপ্রবাহ যেখানে একসঙ্গে এতগুলি cross connection সতত ক্রিয়াশীল তার মধ্য থেকেই নিম্নবর্ণের মানুষদের জীবনাদর্শ, দলিত মানুষদের জীবনচর্চা এবং তথাগতের করুণা ও সাম্যের নীতিকে উপলব্ধি করে আবির্ভূত হল প্রথম বাঙালি মনীষা দীপঙ্কর। এই নাটকের বিষয়বস্তু সাধারণ মানুষের কাছে একটু অচেনা, নাটকের formএও আমরা একটা epic form ব্যবহার করেছি যেখ নে ব্যক্তিগত চরিত্রের জটিলতার দিকে, দ্বন্দ্বের দিকে বেশি গুরুত্ব না দিয়ে আপ্রাণ চেষ্টা করেছি কালস্রোতকে দর্শকের সামনে তুলে ধরতে। প্রযোজনায় দেশীয় প্রথা প্রকরণ সহিত form কে আশ্র করে (এখানে আমার সুযোগ্য ছাত্র দেবকুমার পাল এর নাম অবশ্যই স্মরণ করতে হয়) প্রযোজনাটিতে বিনোদনের একটা অন্য মাত্রা দিতে চেয়েছি। যেহেতু কোন নিটোল গল্প এই নাটকে নেই, সেহেতু আপাতভাবে দর্শকের কাছে এ নাটকের আবেদন হয়তো শূদ্রায়নের মত স্পর্শকাতর হচ্ছে না, কিন্তু নাট্যকাঠামো বা Theatre Structure এ পরীক্ষানীরিক্ষার প্রয়াস যদি না চালানো যায় তবে থিয়েটার করে লাভ কি? দায়বদ্ধতার নামে আপন স্ব-ভূমিকে অস্বীকার করে নিরাপদ আশ্রয়ে থিয়েটারকে খোঁজার অন্ধগলিতেই কি আবদ্ধ থাকব আমরা? এমনিতেই তো আমাদের থিয়েটার minority culture প্রতিষ্ঠানিক দাক্ষিণ্য থিয়েটারের ক্ষেত্রে সব চাইতে কম – কিন্তু এটাই কি আমাদের সবচাইতে বড় জোর নয়, এই জায়গা থেকেই দাঁড়িয়ে আমি থিয়েটারের ভাষায় থিয়েটারের বিন্যাসে থিয়েটারের মধ্যে থেকে একটা প্রতিবাদ তুলতে পারি – যতই অস্বীকার করার চেষ্টা করুন না কেন, এই প্রতিবাদই কি রাজনীতি নয়?

কালচক্র নাটকে দীপঙ্কর যখন নিম্নবর্ণের মানুষদের কাছে এসে বলেন "আপনি কাজে আত্ম নিয়োগ কর, তাই তোমার ধর্ম (ধর্মং শরণং গচ্ছমি), উপযুক্ত নেতা বা পথ প্রদর্শকের শরণ নাও, তিনিই তোমার বুদ্ধ (বুদ্ধং শরণং গচ্ছমি), সর্বোপরি সমাজ ও সংগঠনে প্রাণ সমর্পণ কর (সংঘং শরনং গচ্ছামি) - এই তিন কাজেই তোমার চিত্তনিবৃত্তি ঘটবে। আর এতেই মানব সমাজের মুক্তি" - তখন কি ধর্মের

এক নতুন রাজনৈতিক ব্যাখা পাওয়া যায় না? মানবধর্মই যে পৃথিবীর সব থেকে বড় ধর্ম। কার্লমার্কস থেকে রবীন্দ্রনাথ অবধি আমাদের মননে ও চিন্তনে কি তারই প্রতিফলন ঘটে না?

এখন এজন্য দরকার প্রকৃত জ্ঞানচর্চা। আমার মনে হয় আমাদের থিয়েটারে প্রকৃত থিয়েটারচর্চার সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানচর্চারও অভাব ঘটছে খুব। এ অভাব আজ গোটা সমাজেই পরিলক্ষিত যার জন্যই আমরা লোভের ফাঁদে, ভোগবাদী সমাজে আটকে পড়েছি। ব্যবসায়িক মুনাফার কথা মাথায় রেখে বিভিন্ন মাধ্যমগুলিকে যে যেমন ভাবে পারছি, তেমনভাবে ব্যবহার করে সত্যিই এক অদ্ভুত আঁধারের দিকে এগিয়ে চলেছি আমরা। কিন্তু এ আঁধার পেরিয়ে যাবার স্বপ্ন চোখে নিয়েই তো আমাদের থিয়েটার করা। অন্তত ব্যক্তিগতভাবে আমি তা বিশ্বাস করি। আর তাই মনে করি থিয়েটার রাজনীতি ও সমাজবিচ্ছিন্ন হতে পারে না - কোনও বিশেষ দলের পক্ষ অবলম্বন করলেন কি করলেন না সেটা বড় কথা নয় – সমগ্র পৃথিবী যদি নাও ধরি, শুধু যদি আমার নিজের দেশ ও সমাজের কথাই ধরি, সেখানেও আপাত শান্তির নামে অন্ধকার জগতের নিয়ন্ত্রণ ক্রমশই অদৃশ্য থাবা বাড়িয়ে আমাকে গ্রাস করতে চাইছে। তার বিরুদ্ধে ক্ষুদ্র হলেও একমাত্র প্রতিবাদ হতে পারে থিয়েটার এবং সে থিয়েটার নিঃসন্দেহেই আপন ঐতিহ্য অনুসরণকারী রাজনৈতিক থিয়েটার।

সৌঃ বিষয় থিয়েটার ২০০৩